ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 130-136
www.athenajournalcbm.in

শঙ্খ ঘোষের কবিতা: অনন্ত আলোর উদ্ভাস

সুরজিৎ প্রামাণিক*

প্রাপ্ত: ২০.১২.২০২৩ পরিমার্জন: ১৭.০৩.২০২৪ গৃহীত: ৩০.০৪.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *চোখের তারায় উদ্দাম তরবারি এঁকে, উত্তাল সভ্যতার উন্মত্ত হলাহল ধ্বংস করার কথা বলতে পারেন যে কবি, তিনি শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১)। আবার শঙ্খ ঘোষই অনুভবের গভীরতর প্রদেশে যাত্রা চালিয়ে দেখেন, বিশ্ব-সংসারের শৃঙ্খলায় মানুষের চেতনা ও চৈতন্যবোধ লুপ্তপ্রায় হওয়ার নিদারুণ প্রতিচ্ছবি। বিগত শতাব্দীর অর্থাৎ বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতায়, কবি শঙ্খ ঘোষের স্বতন্ত্র কাব্য-দক্ষতা ও স্বকীয় কাব্য-ভাষা উচ্চারণের ব্যতিক্রমী প্রতিভা বাংলা কবিতার পাঠককে অনায়াসেই মোহিত করে। আদতেই পঞ্চাশের দশকের একঝাঁক মহীরূহপ্রতিম কাব্য-তারকার মধ্যে অবস্থান করেও, শঙ্খ ঘোষ স্বয়ং এক নক্ষত্রসম দীপ্তির বিচ্ছুরণ হয়ে উঠতে পেরেছেন বাংলা কবিতার আকাশে। যে নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় প্রভায় বাংলা কবিতার পাঠক প্রদীপ্ত। স্বাভাবিকভাবেই কাব্য-সাধনার নিরলস সততায় এবং চৈতন্যের নিগূঢ় একাগ্রতায় বাংলা কবিতার প্রশস্ত প্রান্তরে এক একটি বটবৃক্ষের মতো বিস্তৃত পংক্তি দিয়ে গেছেন তিনি। যার শাখা প্রশাখা নিত্য প্রবহমান হয়ে চলেছে পাঠকের ভাবনার শস্যক্ষেত জুড়ে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, আলোক সরকার প্রমুখের সমকালে আবির্ভূত হয়ে, একজন শঙ্খ ঘোষ যেভাবে 'পিশাচ পোশাক খুলে', 'মানবশরীর' পরে নেওয়ার সাধ ও সাধ্য দেখিয়েছেন, তা নিশ্চিতভাবেই বাংলা কবিতার বৈচিত্র্যময় আদিগন্ত পটভূমিতে এক অভিনব মাত্রার সংযোজন।*

সূচক শব্দ: *প্রতিশ্রুতি—প্রতিশ্রুতিহীনতা, একাত্মতা—নিঃসঙ্গতা, অবক্ষয়—বিপন্নতা, জন্ম—মৃত্যু, জগৎ ও জীবন।*

*পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।
e-mail: surajitpramanik08@gmail.com

আমি-তুমির লীলায়, জাগতিক পৃথিবীর জীবন-মৃত্যুর পথের ধুলোয়, গঙ্গা যমুনার জলপথ থেকে শুরু করে, স্থলপথের নাগরিক জনপদে নিরন্তর ছুটে চলা চাকায় ভর রেখে, শঙ্খ ঘোষের কবিতায় যেমন শহরের নাগরিক জীবনের বিধ্বস্ত ছবি প্রতিভাত হয়েছে, ঠিক তেমনই গ্রাম জীবনের সবুজ সতেজ প্রান্তরের ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে সমানভাবে। এক অতীব আজগুবি সময়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে অসংখ্য অযাচিত অনর্থক প্রলাপের পর, কোনও একদিন আমাদের ক্লান্ত হওয়ার কথা ছিল ঠিক। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ক্লান্তির উর্ধে আমাদের নিয়ত যাত্রাপথ যেন নির্ধারণ করা আছে যথার্থ। তাই গভীর অর্থে কোনও মানুষই ক্লান্ত নয়। কারণ প্রতিটি মানবজীবন অনায়াসেই রপ্ত করে নেয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অহরাত্র ঘটে চলা উত্থান পতনের ইতিহাস। তাহলে কবিও কি সেই অনুশীলন করেন! তাঁরাও কি দুঃসময়ের বিভীষিকায় ক্লান্তিহীন! এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। উত্তরও আছে যথাযথ। আদতে সর্বকালেই কবি ও শিল্পীরা চূড়ান্ত ক্লান্তি বোধ করেছেন এবং মর্মে মর্মে আহত হয়েছেন অহর্নিশ, এ পৃথিবীর জঘন্য লালসা ও কদর্য উন্মাদনার অবক্ষয়ে। আর সেই ক্লান্তি থেকেই যুগে যুগে নৈরাশ্যের কথা উঠে এসেছে শিল্পে, সাহিত্যে বা কবিতায়। উঠে এসেছে প্রবল হতাশার বিপুলতর সংকেত। তবে এখানেই শেষ নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সময়ের অসহ্য দাবদাহে একজন শিল্পী যতখানি দগ্ধ হয়েছেন, তাঁর শিল্প ততখানিই হয়েছে ক্ষুরধার, এ কথাও আমরা জানি। কবি শঙ্খ ঘোষও এই ভাবনার ব্যতিক্রম নন। বাংলা কবিতার ভাবনাবিশ্বে, কাব্য-চৈতন্যের প্রাণময় আলোয় এবং তাঁর শৈল্পিক-মনের অভিপ্রায়ে নিরবধি সারল্যের অনুধ্যান করেছেন শঙ্খ ঘোষ পাশাপাশি তিনি চাতুরিময় ঘূর্ণাবর্তের মেঘ জমতে দেননি তাঁর কবিতার বিস্তীর্ণ আকাশে। কাজেই কাব্যবোধের পরিপাট্য সীমায় দাঁড়িয়ে অথবা নিত্যদিনের যাত্রাপথ শেষ করে ঘরে ফেরার পর, তাঁর প্রকাণ্ড আত্ম-জিজ্ঞাসা তৈরি হয়— "বড়ো বেশি কথা বলা হলো?"[১] এই সহজতম আত্ম-জিজ্ঞাসার অনুরণন নিরন্তর অনুরণিত হতে থাকে প্রগাঢ় আত্ম-অনুসন্ধানের পথ ধরেই। শঙ্খ ঘোষ সেই আত্ম-অনুসন্ধিৎসু প্রবণতায় বুঁদ হতে পেরেছিলেন বলেই, তিনি ব্যক্তিগত মনন ও ব্যক্তিগত সত্তার সমীপে প্রশ্নচিহ্ন রাখতে পেরেছেন নির্দ্বিধায়,— "চতুরতা ক্লান্ত লাগে খুব?"[২] ব্যক্তি জীবনের নিত্যক্রিয়ায় এই প্রশ্নের গোলক তো সর্বত্রই সর্বজনের নির্মাণ করার কথা ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই বোধ হয় তা হয় না। কারণ সীমাহীন আত্মকেন্দ্রিক মগ্নতায় ডুবে যাওয়া বাণিজ্য বায়ুর গল্পে মুখর পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে, আদতেই ঈশান কোণে লেগে থাকা জ্যোৎস্নায় বিভোর হতে ভুলে গেছি আমরা। তাই ঘরে ফিরে "স্নান করে ধূপ জেলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে বসে"[৩] থাকার অভিপ্রায় নেই আমাদের, মানবসভ্যতার অবক্ষয়-সিদ্ধ পরিযায়ী বিদ্যুৎ চমকে। আত্ম-অন্বেষণের নান্দনিক চিত্রপটে শঙ্খ ঘোষ একজন অনন্ত স্রষ্টার মতো গভীরতর এইসব সংকেতের ছবি এঁকে গেছেন বাংলা কবিতার বৈচিত্র্যময় ক্যানভাস জুড়ে। তাই তাঁর কাব্যবোধের সূক্ষ্ম তুলিতে মানবজীবনের পালকে লাগে রং এবং তাঁর অকপট জিজ্ঞাসায় পাকস্থলী ভর্তি ইঙ্গিতের আনত শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় অবিরত।

"মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে পড়ে নিই
মানব শরীর একবার?

দ্রাবিত সময় ঘরে বয়ে আনে জলীয়তা, তার
ভেসে-ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশয়ন লাগে ভালো?

যদি তাই লাগে তবে ফিরে এসো। চতুরাতা, যাও।
কী-বা আসে যায়

লোকে বলবে মূর্খ বড়ো, লোকে বলবে সামাজিক নয়।"[৪]

—('মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়')

আসলে বর্তমান মানব-সভ্যতার আহাম্মক উন্মাদনায় কেবলই চতুরতার পাখনায় ভর করে মানুষ হাসাহাসি করে সেই মানুষকে দেখে, যে নিচু হয়ে সমস্ত পথের ধুলো বুকে নেয়। তবে পথে বসানো উলঙ্গ ভিখারিনীর দু'চোখের রেখায় প্রতিবাদের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকতে পারে, তা আমরা অনায়াসেই স্মৃতি বিভ্রান্ত হই। ব্যক্তি-স্বার্থের সংক্রামক মায়াজালে প্রতিটি সন্ন্যাসীই কি সার্বিকভাবে পিছুটান উপেক্ষা করতে পারে! এ প্রশ্নও তো থেকে যায়। উত্তরও আছে, উপেক্ষা কেবলই উপেক্ষা দিয়ে নয়। নিয়ত শীতের রাত্রে, স্বচ্ছ জলের আগুনে জীবন ও সভ্যতার সবটুকু ধরে টান দিতে হবে আমাদের। তারপরে ত্রাণ—তারপরে পরিত্রাণ। যে পরিত্রাণ সম্ভব মানবধর্মের নিরন্তর সাধনার পথে। তাই শ্মশানের চিতা সাজাবার সময়ে এত বেশি হল্লা ভালো নয়। ভালো নয় ক্লেদাক্ত উল্লাস। "তার অন্তর জুড়ে, অন্তর্দাহ নাকি অন্তর্ধানের ইচ্ছা—কে জানে! নাগরিক রাত শুধু দ্যাখে একঘেয়ে এক ক্লান্ত রুটিন, দ্যাখে সারি সারি বাড়ি আর গাড়ি আর পথচারী জনতার পায়ে পায়ে ক্রমশ ছাড়িয়ে যায় তার পাল্লা—বৃহৎ এক বাজারের মাঝে। শ্যামবাজার বাগবাজার ছাড়িয়ে, রাজাবাজার রাধাবাজার লালবাজার ছাড়িয়ে, শহর ছাড়িয়ে আরো দূরের শহরের দিকচক্রবাল ছাড়িয়ে, দেশ ছাড়িয়ে, পৃথিবীময়।"[৫] পৃথিবীর এই স্পন্দনের স্নায়ু যেন নিরন্তর আবর্তিত হয় এক অদেখা গহ্বরের ঘূর্ণিপাকে। তাই মানবধর্মের শীতল স্বচ্ছতায় আমরা যেন সহিষ্ণু হতে পারি, প্রতিবিন্দু আনন্দ বুদ্বুদের মতো। 'ধর্ম' কবিতায় শঙ্খ ঘোষ বলছেন,—

"শুয়ে আছি শ্মশানে। ওদের বলো
চিতা সাজাবার সময়ে
এত বেশি হল্লা ভালো নয়।

. . .

আর, নাম-না-জানা মুণ্ডমালা থেকে
ঝরে পড়ুক, ধর্ম ঝরে পড়ুক
ঠান্ডা মুখে, আমার ঠান্ডা বুকে, ঠান্ডা!"[৬]

—('ধর্ম')

কাজেই 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'বার মন্ত্র অনুধাবন করতে করতে কেবলই উন্মুক্ত হতে হবে আমাদের। আর যদি তা সম্ভবপর না হয়, তবে অসহ্য সংকীর্ণতার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেও, মুক্তির অবারিত দরজা উন্মুক্ত করে মানবসভ্যতার বুকে পবিত্র আলোর উদ্ভাস ছড়িয়ে দেওয়াটাও একপ্রকার অসাধ্য-সাধন হওয়ার মতো। ফলে অন্তরাত্মার ভীষন জাগ্রত রূপ নিরবধি কল্পনা করেন কবি শঙ্খ ঘোষ। ঔদাসীন্যের রোমাঞ্চিত হাওয়ায়, দিগ্বিদিক উড়ে যেতে যেতে, ঘরে ফিরে প্রেম আর আবেগের বৈভবে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে একাত্ম হতে চান তিনি। আর তা চান বলেই, অনুভব করতে পারেন 'হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়'। যৌবনের ফুটন্ত অগ্নিশিখা থেকে বার্ধক্যের নিভন্ত খেয়াটি সারাজীবন যে, উদগ্র আবেগসর্বস্ব প্রেমের আবহে বইতে পারা সহজ নয়, সে কথাও তাঁর চেতনায় রেখাপাত করেছে। তাই জীবনপথের অতীব বক্ররেখায় সম্পর্কের বুনন যতখানি সহজ আমরা মনে করি, আদতেই সেই সহজ কথা ততটাও সহজ নয়। তবু সমস্ত দিনের পোড় খাওয়া ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরার পর প্রিয়জনের সাথে মিলে যেতে চান তিনি। কারণ সেই নিঃশব্দ অবলম্বনের ভেতর মুক্তির অভূতপূর্ব স্বাদ আছে। আছে প্রাণের গভীরতর আস্বাদ। তাই তিনি বলতে পারেন,—

"আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই
তুমি আছো তুমি।"[৭]

—('তুমি')

গত শতাব্দীর তিরিশের কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় যেমন লিখতে পারেন,—"আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।"[৮] তেমনি জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতায় বা

জীবনানন্দের থেকে সময় পর্বের নিরিখে প্রায় দুই দশকের ব্যবধানে অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে কবিতা লিখতে এসে শঙ্খ ঘোষ, বাংলা কবিতার আকাশে সংযোজন করলেন অসামান্য এক কাব্যবোধের নিবিড় সূর্যরেখা।

"আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার"[৯]

—('গঙ্গা যমুনা')

জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, একজন কবির এরকম নির্দ্বিধ সত্য উচ্চারণ যে অনায়াসেই তাঁকে পারিপার্শ্বিক সীমানার বাধা কাটিয়ে অসীমের সন্ধানে এগিয়ে দেবে, এ তো খুব স্বাভাবিক। আত্ম-মন্ময়তার নিভৃত স্ফূরণে শঙ্খ ঘোষ যেভাবে আত্মার নিগড়ে নিমগ্ন হতে পেরেছেন, তা বাংলা কবিতার পাঠকের চেতনায় অভিনব সুরের দোলা জাগিয়ে দেওয়ার মতো। তাই বিশ্বপরিক্রমণের পরেও একবার শঙ্খ ঘোষের কবিতার অনন্ত ঝর্ণাতলায় মাথা পেতে বসতে সমর্থ হলে, সমস্ত স্তব্ধতার গহ্বর থেকে যেন জীবনের কদর্য গ্লানিগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুদ্ধতার হাজারদুয়ারি ভালোবাসায় বন্ধ দুয়ার খুলে দেওয়ার মতো আসলেই শঙ্খ ঘোষ যে ব্যঞ্জনায় জীবনেরই সমস্ত সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে তাঁর সৃজনের মহীরূহ ভাব ও বোধিবৃক্ষ রোপণের ইঙ্গিত রেখেছিলেন এবং সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন, নিঃসন্দেহে তা অনবদ্য। কাজেই জ্ঞান-চৈতন্যের মহিমময় আলোয় নিরন্তর নিজেকেই প্রত্যক্ষ করতে হবে আমাদের। প্রয়াগের সঙ্গমে না হলেও, গঙ্গার পবিত্র বারিধিতে ধৌত করতে হবে সংসার জীবনের অন্ধকূপমন্ডুকতার কালি লেগে থাকা হাত। 'হাজারদুয়ারি' কবিতার ছত্রে ছত্রে লেগে থাকা সে ইঙ্গিত পাঠকের কাছে নিশ্চিতভাবেই স্পষ্ট,—

"একবার তাকাবে না? নিজের মুখের দিকে চোখ ভরে?
মাঝে মাঝে ফিরে দেখা ভালো নয়?
তুমি হাত ধুতে পারো এত গঙ্গা জল জানে কোন্ দেশ!
মাঝে মাঝে ধুয়ে নেওয়া ভালো নয়?
তাই আমি আমার দক্ষিণ হাত
রেখেছি নিজের বুকে।"[১০]

—('হাজারদুয়ারি')

এই আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়েই বিশ্ববিধাতা কীভাবে বরণ করে নেয় আমাদের, তা নির্ঘাৎ উপলব্ধি করতে পারেন কবি শঙ্খ ঘোষ। বয়স নিঃশব্দে বাড়তে থাকে আমাদের, আর বিশ্ববিধাতার দুরাশায় কোনো কিছুই যে অন্তিম পূর্ণতার দিকে পৌঁছতে পারে না যথার্থ, তাও তিনি বোঝেন। সময়ের উগ্র দাঁতের কৌটো, তাঁর সখাদের অস্থির উপর ছোবল দিলে, প্রবল প্রবাহমান বৈঠা গর্জন করে ওঠে শঙ্খ ঘোষের কবিতার কূলে দাঁড়িয়ে। তবু আহাম্মক পৃথিবীর আকুলতায় প্রতিটি নির্বোধ জীবন অনর্থক উন্মাদনার অসহ্য হলাহলে মেতে ওঠে অন্ধের মতো। কাজেই দৃশ্যগোচর অস্তিত্বের অর্থহীনতার মধ্যেই, যে অর্থ লুকিয়ে আছে সেই অর্থের অনুসন্ধানলব্ধ হতে হবে আমাদের। আসলেই "তাঁর কবিতায় নান্দনিক ও সামাজিক সত্যের যুগলবন্দী যেন স্বতঃসিদ্ধ। তাই তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে বারবার ফিরে যেতে হয় কবিতারই মতো মৃদু, স্নিগ্ধ অনুভব-সঞ্চারী গদ্য-ভুবনে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ঐতিহ্য-অস্বীকৃতির নামে যখন নৈরাজ্যপন্থা হয়ে উঠেছিল ভুল আধুনিকতার অভিজ্ঞান, সে-সময় শঙ্খ ঘোষের মতো মাত্র দু'তিনজন কোলাহল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন একান্তে নিজস্ব সংবেদনায় ঋদ্ধ কবিতার সন্ধানে।"[১১] এই সংবেদনা থাকলেই তো সারাজীবনের কর্ম-প্রচেষ্টা ও কর্ম-উদ্দীপনার সীমাহীন সমীকরণ চিহ্নিত করা যায় মানব-সংসারের পরিমণ্ডলে। যেখানে অন্ধকার নীরবতার ভেতর নীরব আশ্রয় হয়ে ওঠে সখ্য। 'অন্তিম' কবিতায় শঙ্খ ঘোষ লিখলেন,—

"সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায়:
বসতি নির্মাণ, বংশরক্ষা;
তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে
সিঁদুরচিহ্নের মতন সখ্য"[১২]

—('অন্তিম')

এই সখ্যের আকাশ জুড়ে জুড়ে 'বেঁচে থাকলেই, বেঁচে থাকা সহজ, মরলে মৃত্যু সুনির্ঘাত'। এভাবেই ছদ্মের সংসারে আমাদের প্রাত্যহিক এগিয়ে চলা কানামাছি জীবন। প্রতিশ্রুতির পাহাড় কেটে কেটে ভেঙে ফেলা নীরবতা। যে নীরবতায় গভীর রাতের কুন্ডলী, কুয়াশায় কেঁপে ওঠে। প্রতিশ্রুতির দৃঢ় অঙ্গীকার ছ্যাঁদা হয়ে যায়। তাই সমকালীন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন 'কেউ কথা রাখেনা'-র মতো চূড়ান্ত ও শাশ্বত সত্যের উচ্চারণ করেন, তেমনি শঙ্খ ঘোষও 'প্রতিশ্রুতি' কবিতার শিরোনামে প্রতিশ্রুতিহীনতার কথা বলে যান নির্দ্বিধায়। বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে ভালোবাসায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 'বরুণা'-রা যেমন কথা না রাখতে পারে, তেমনি শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও উঠে আসে অসামান্য এক প্রতিচ্ছবি।

"এখন আমি অনেকদিন তোমার মুখে তাকাব না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, তুমি রাখোনি কোনো কথা।
এখন ওরা অনেকদিন আমার মুখে তাকাবে না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি ভেঙেছি নীরবতা।"[১৩]

—('প্রতিশ্রুতি')

আসলেই জীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধের জন্যই প্রিয়জনের ভালবাসায় ফিরে যেতে হবে আমাদের। নিঃসঙ্গ নির্জনতার পাত্র থেকে উপচে পড়া অনন্তের একাত্মতায় মগ্ন হওয়ার সেই মন্ত্র আছে শঙ্খ ঘোষের কবিতার দর্শনে। সনাতনী মাঠ পেরিয়ে এসে, জ্বলে ওঠা সলতের তাপ বুকের ভেতর উপলব্ধি করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ। তাই গ্রহের ফেরে আমাদের পারস্পরিক মুখোমুখি হয়ে যাবার এ জগৎ ঘূর্ণনের তীব্র সম্ভাবনাময় উচ্চারণ করতে পেরেছেন তিনি। চিরন্তন এই সত্যের অঙ্গীকার থেকেই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আত্মসত্যের উৎসার ঘটেছে। কাজেই দিনযাপনের নিশান উড়িয়েই কেবল প্রণাম সেরে নেওয়া নয়, 'পা' দুটি এখনও স্ব-মহিমায় বিরোচিত কিনা এবং সেই পদযুগলে স্ব-প্রাণ অস্তিত্বের সঞ্চার আছে কিনা, দেখে নেওয়ার জন্য প্রণামের বড়ো প্রয়োজন।

আবার ছদ্মবেশ ধারণ করা সংসারে কানামাছিময় জীবনের হোঁচট খাওয়া পরিণতিটিও কবিতার বুননে নিপুন ভাবে গেঁথে যান অক্ষরমালায়। দেখিয়ে যান, জ্ঞানহীন, সারল্যহীন, অবিমিশ্র ঝড়ে ঝাপসা ক্ষত-বিক্ষত আস্তিন টাঙিয়ে হেঁয়ালিতে বিভ্রান্ত হওয়া রোজকার নিদারুণ প্রতিচ্ছবি। তাই না বলা কথাগুলো জাগতিক পৃথিবীতে না বলাই থেকে যায় আমাদের, অথবা বলা হয়ে ওঠে না কোনওদিন। তবু প্রিয়জনের সঙ্গে দেখাহীন এক অদেখা পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে, শঙ্খ ঘোষ আশাবাদী হতে পারেন। সুপারিবনের কিনারে, বাঁশের সাঁকোয়, তুলসীতলায় হয়তো দেখা হবে কখনওবা প্রিয়জনের সঙ্গে অকস্মাৎ এই জাগতিক সভ্যতার অনন্ত ঘূর্ণিময় চাকায়, এই আশাটুকু নিয়েই পড়ে থাকা যায়। তবে ক্ষত সেরে যাবার পরেও যেমন দাগ লেগে থাকে, ঠিক তেমনই সেদিনেও হিসাব মেলে না হৃদয়ের গভীরে জাপটে থাকা অবশিষ্ট ব্যাথার। কে দেবে কাকে উপশম! কবির সামনে দিয়ে হেঁটে যায় মেঘের মতো মানুষ। মানুষেরই নিকট সান্নিধ্যে যে মেঘ হয়তো ছায়া হয়ে নেমে আসতেও পারে। আবার বিজ্ঞাপনের উন্মাদনায় মুখ ঢেকে যাওয়ার উপলব্ধিতে যখন স্নিগ্ধ চোখের চাহনিটুকু বিকিয়ে গেছে ভাবতে পারেন, ভাবতে পারেন ব্যক্তিগত যা কিছু সব নিয়নের আলোয় অথবা ঝাপসা অন্ধকারে পণ্য হয়ে গেল, তখনই আবার এই ভাবনাও তাঁর অনুভূতিতে আসে,—

"যেন আমাদের সামনে কোথাও কোনো অপঘাত নেই আর
মৃত্যু নেই দিগন্ত অবধি

তোমার জন্মদিনে কী আর দেব শুধু এই কথাটুকু ছাড়া যে
কাল থেকে রোজই আমার জন্মদিন।"[১৪]

—('জন্মদিন')

শঙ্খ ঘোষের সমকালীন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁর ভালোবাসার কোনও জন্ম হয় না, কোনও মৃত্যু হয় না। অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না বুকে নিয়ে তিনি জন্মেছেন। আর শঙ্খ ঘোষ 'মুখ

ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কবিতায় লিখলেন,— 'মুখের কথা একলা হয়ে/রইল পড়ে গলির কোণে/ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু/ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।' পাশাপাশি আবার 'কোথাও কোনো অপঘাত নেই'—এই কথার উচ্চারণ তো আদতেই ভাবনার বৈপরীত্য হওয়ার সামিল। যে অপঘাত সময়ের; যে অপঘাত সভ্যতার; যে অপঘাত মানব সংসারের; সেই অপঘাতের অবিশ্বাস্য বাহার অর্থাৎ কৃত্রিমতায় ভর করে আমাদের মানবিক অনুভূতির নিরন্তর নিম্নগামীতা যেখানে গোটা একটা বিশ্ব পরিস্থিতি বদলে দিল; সেখানে 'মৃত্যুও নেই দিগন্ত অবধি'—এই প্রতিধ্বনি জাগানো আসলে কবির নিজের সঙ্গেই নিজের লড়াই বলে মনে হয়। যে লড়াইয়ের পটভূমি জুড়ে বেঁচে থাকার আনন্দে মানব-সভ্যতার মাটিতে এক মুহূর্ত শান্তির প্রানবায়ু আস্বাদন করতে চেয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। জন্ম-জন্মান্তর ধরে পৃথিবীর চলমানতায় নিত্য অবস্থানরত কবি, তাঁর প্রিয়জনকে কথা দিতে পারেন মানে অন্তরঙ্গ তাৎপর্যে প্রিয়জনের নিকট গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে চান তিনি। তাছাড়া কথা দেওয়ার কথা মানে নিরর্থক শব্দের অপ্রয়োজনীয় জাল বিস্তার নয়। কারণ নৈঃশব্দের পাহাড়ে সারল্য থাক বা না থাক, বাচালতার চোরাকুঠুরিতে যে গভীর চতুরতা আছে এবং তা যে কোনও সূক্ষ্ম অনুভূতিলব্ধ মানুষের চৈতন্যকে ক্লান্ত ও আচ্ছন্ন করে, এই উপলব্ধি কবি শঙ্খ ঘোষেরই। তাই চুপ করে বসে থাকা ভালো।

"ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?
চতুরতা ক্লান্ত লাগে খুব?

মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধূপ জ্বেলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে
বসে থাকি?"[১৫]

—('মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়')

এভাবেই অতিকথনের পরে অনন্ত নিস্তব্ধতা বড়ো কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। তাই মানবজীবন ও জগতের যাবতীয় পৈশাচিক প্রবনতা সরিয়ে, নিঃশব্দে মানবিক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় বুঁদ হতে পারেন কবি শঙ্খ ঘোষ। কারণ তীব্র শব্দের চেয়ে, সুতীব্র শব্দহীনতার আয়ু অনেক দীঘল। 'আয়ু' কবিতাতে সে কথা স্পষ্ট করে দেন তিনি।

"এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো
শব্দহীন হও...

তোমার চোখের নিচে আমার চোখের চরাচর
ওঠে জেগে

স্রোতের ভিতরে ঘূর্ণি, ঘূর্ণির ভিতরে স্তব্ধ

আয়ু
লেখো আয়ু, লেখো আয়ু
চুপ করো শব্দহীন হও।"[১৬]

—('আয়ু')

এভাবেই অনির্বাণ কাব্যকথনের ভাষ্যে চিন্তনের যৌক্তিক বিস্তার দেখিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। 'ডান পাশে ধ্বস', 'বাঁয়ে গিরিখাদ', 'মাথায় বোমারু', 'পায়ে পায়ে হিমানির বাঁধ' জমতে থাকা সত্তায় যখন 'আমাদের পথ নেই কোনো', যখন 'আমাদের ঘর গেছে উড়ে', 'আমাদের শিশুদের সব ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে' যখন, যখন মুহূর্তের খুব কাছে মৃত্যু আগত আমাদের, তখন পথহীনতার পথেই বেঁধে বেঁধে থাকার বার্তা জাগাতে পেরেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ বাংলা কবিতার আদিগন্ত অববাহিকায়। ইতিহাসহীন ইতিহাসে মরে যাওয়া অথবা বেঁচে থাকা পৃথিবীর মাঝে তাঁকে দেখতে চাওয়া উদাসীনতার হাতে হাত রেখে তিনি কাটাতে পারেন সমগ্র জীবন। অস্তিত্বের এই সংশ্লেষই তো দরকার। তাই শঙ্খ ঘোষের কবিতার অন্তর্গত

অবয়ব যদি যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হয়, তাহলে আত্মজাগরণের এই প্রশ্বাস নিয়ে আমরাও জীবনের কাছে সম্মোহিত হতে পারি।

সূত্র নির্দেশ:

১. ঘোষ, শঙ্খ, (২০২০), *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৭।
২. *তদেব*, পৃ. ৮৭।
৩. *তদেব*, পৃ. ৮৭।
৪. *তদেব*, পৃ. ৮৭।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, (১৪১১ ব.), *কবিতা নিয়ে,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১১৩।
৬. ঘোষ, শঙ্খ, (২০২০), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯।
৭. *তদেব,* পৃ. ৮৬।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, (২০১৭), (সম্পা.), *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১০৮।
৯. ঘোষ, শঙ্খ, (২০২০), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬।
১০. *তদেব*, পৃ. ৩৯।
১১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, (২০১৪), *শঙ্খ ঘোষ সৃষ্টি ও নির্মাণ,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১১।
১২. ঘোষ, শঙ্খ, (২০২০), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।
১৩. *তদেব*, পৃ. ২৯।
১৪. *তদেব*, পৃ. ১৩৫।
১৫. *তদেব*, পৃ. ৮৭।
১৬. গোস্বামী, জয়, (২০০৮), *জয়ের শঙ্খ,* প্রতিভাস, পৃ. ৩২।